দ্বাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগে নারীশিক্ষার কথা

(Women's Education in Mediaeval Period)

মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা ● মোগলযুগের কয়েকজন বিদুষী রমণী ●

মধ্যযুগে নারীশিক্ষার ব্যাপারটা খুব আশাপ্রদ ছিল না। নারীশিক্ষার গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। কেবল রাজা, মহারাজা, সম্রাট ও অভিজাত পরিবারগুলিতে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হত, অবশ্য কোনো কোনো মোগল সম্রাট নারীদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এই সময় কোনো কোনো মহিলা কবিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজের অভিজাত শ্রেণির মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপার দেখে সমাজে যাদের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল তারাও একইভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য লেখাপড়ায় আগ্রহী হলেন। অবশ্য লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ না থাকারও কয়েকটি কারণ ছিল। যেমন "After marriage, the life of Mediaeval woman whether Muslim or Hindu, somewhat prosaic. Her main business was to look after the household and take care of their children and so they could spare less time for literacy pursuits." কী হিন্দু কী মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়ে যেত। বিয়ের পর চার দেওয়ালের মধ্যেই দিন কাটাতে হত। বিশেষ করে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। কী হিন্দু কী মুসলমান সম্ভ্রান্ত বাড়ির মেয়েরা ঘোমটা না দিয়ে অতিথি অভ্যাগতদের কাছে ও এমন কী বাড়ির গুরুজনদের কাছেও যেতে পারত না। এ সব কারণে সম্ভ্রান্ত পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা কিছু থাকলেও দরিদ্র গৃহস্থদের মেয়েরা শিক্ষা থেকেই একেবারেই বঞ্চিত ছিল।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি সওদাগরের দুই পত্নী লহনা ও খুল্লনার উল্লেখ আছে, যারা লেখাপড়া জানতেন। ধনপতি বাণিজ্যে গেলে বড় স্ত্রী লহনা ছোটো স্ত্রী খুল্লনাকে একটি চিঠি দেখিয়ে জানায় যে, খুল্লনাকে শাসন করার দায়িত্ব স্বামী তাকে দিয়ে গেছেন। হাতের লেখা দেখে অবশ্য খুল্লনা বুঝতে পারে যে চিঠিটি জাল। একই কাব্যে কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরা তার স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় রামায়ণ সহ নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকাব্যে রাজকুমারী বিদ্যার বুদ্ধিমত্তা ও নানা শাস্ত্রের পারঙ্গমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এভাবে দেখা যায়, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বহু নারী কবি ও বিদুষী মহিলার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

মেয়েদের নিজস্ব কোনো পাঠশালা ছিল না। ছেলেদের সঙ্গেই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ নিতে হত। বিবাহ পরবর্তী জীবনে মেয়েদের যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হত সে

SHOT ON REDMI 7

Scanned with CamScanner

ব্যাপারেও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। তবে অভিজাত পরিবারের মেয়েরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারতেন।

মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা :

কোরানে বলা হয়েছে "তারা (মেয়েরা) তোমাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ, এবং তোমরাও (পুরুষেরা) তাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ, অর্থাৎ সামাজিক দাবীতে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে সম্মান ও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সেখানে স্ত্রীকে ভোগের পাত্রীরূপে ব্যবহার করা চলবে না।" সেই কোরানের নির্দেশ মেনে হজরত মহম্মদ প্রচার করলেন, প্রত্যেক নরনারীর জন্য বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য কর্তব্য এবং বিদ্যালাভ করতে যদি সুদূর চিনদেশে যেতে হয় তবুও তা স্বীকার্য। হজরতের যুগে শিক্ষালাভের জন্য কোনো মহিলাকেই চিনদেশে যেতে হয়নি, অথচ সেই যুগেই ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী শিক্ষা বহু মহিলাই পেয়েছেন। মুসলিম সভ্যতার উন্মেষপর্বে হজরতের কথা ফাতেমা, স্ত্রী আয়েষা ও জয়নাব, হামদা, হাফসা, সাফিয়া, মাবিয়া প্রমুখ অন্যান্য রমণী রীতিমত মার্জিত শিক্ষাই পেয়েছিলেন।

তবে আর একটা কথা স্বীকার করতেই হয়, শিক্ষায় ও সাহিত্য গবেষণায় ভারতের বাইরে মুসলিম মহিলাদের সে স্তরে পৌঁছাবার সৌভাগ্য হয়নি, তবু তারা বা একেবারে শিক্ষা পাননি একথা বলা বোধ করি ঠিক হবে না। তবুও "মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র শাসিত ভারতবর্ষে যখন বৈশ্য শূদ্রের স্ত্রী তো দূরের কথা—উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণদের মহিলারাও শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানলাভ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন, তখন সাম্যমৈত্রীর বার্তাবাহক মুসলিম সম্রাটেরা মহিলাদের জন্য যুগোপযোগী এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। নারী জীবনসঙ্গিনী বন্ধু, দাসী নহেন, ইসলামের এই মহান শিক্ষাই মুসলমান সুলতানদের উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁদের রমণীদের মানসিক ও চিৎবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের দিকে।"[১] সম্রাটদের হারেমে স্ত্রী-শিক্ষার যে আলোক জ্বলে উঠেছিল সেই জ্ঞানালোকে রাষ্ট্রের বহুদিক ও দেশ বহুভাবে আলোকিত হয়ে সে যুগের বহু রমণীকে পথের সন্ধান ও আশ্বাস দান করেছে।

মুসলমান আমলে শিক্ষালয় হিসেবে স্কুল-কলেজ, মক্তব-মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, খানকা প্রভৃতি যেমন প্রচলিত ছিল তেমনি মেয়েদের শিক্ষার জন্য অসংখ্য স্বতন্ত্র মক্তব-মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল। মুসলমান সমাজের মেয়েদের জন্য সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তাদের জন্য স্বতন্ত্র মক্তব মাদ্রাসা থাকা সত্ত্বেও পর্দা প্রথার জন্য মেয়েরা সাধারণত নিজেদের বাড়িতে লেখাপড়া শিখতেন। জ্ঞানবৃদ্ধ, ধর্মভীরু ও বয়স্ক শিক্ষকের অভিভাবকত্বে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা অনেকটা ক্ষীয়মাণ। শিক্ষালাভের এই প্রণালী যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য বলে এ যুগেও সকলের পক্ষে এ পথ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, সে যুগেও তেমন হত না। তাই সবার কথা চিন্তা করে সব দিক চিন্তা করে মক্তব-মাদ্রাসা, তৈরি হয়েছিল। সাধারণ মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না। যৎসামান্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, বয়নশিল্প, ঘর সংসার বুঝে নেবার মতো লেখা পড়াই অধিকাংশের জন্য যথেষ্ট ছিল। "তবুও

১. মুসলিম ভারতে স্ত্রীশিক্ষা—মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলি (১ম) বাংলা আকাডেমি ঢাকা, ১৪০১/১৯৯৪ পৃ: ৫২৪

Scanned with CamScanner

মধ্যযুগের মুসলমানেরা কোরানের আদর্শ ও তাদের প্রিয় নারীর জীবন সাধনার অনুপ্রেরণায় মেয়েদের চিৎ প্রকর্ষের ও আত্মিক কল্যাণের দিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি দিয়েছিল।"[১]

মুসলিম আমলে রাজপরিবারের সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সাহিত্যসংঘ (Literary Association) গড়ে উঠেছিল। সেই সাহিত্যসংঘের মধ্য দিয়েই শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক সংযোগ সাধিত হত ও সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যসাধকদের সাধনার পথ প্রশস্ত হয়ে উঠেছিল। রাজপরিবারের লোকদের সহায়তায় এরূপ সাহিত্যসংঘ গড়ে ওঠায় রাজপরিবারের মেয়েদেরও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত।

দিল্লির সুলতানেরাও তাঁদের অধীনস্থ অনেকেই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের রাজ্যে বহু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তার রাজধানী পরিদর্শন করে সেখানে তিনি, বালিকা বিদ্যালয়ের উল্লেখ করে গেছেন। সেখানকার মেয়েরা স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের এবং তাদের অধিকাংশই কোরানের হাফেজ ছিলেন বলে বলেছেন।

মালওয়ার সুলতান গিয়াসুদ্দিন খলজিও স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর হারেমের হাজার পনেরো পুরনারীর মধ্যে অনেকে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, অনেকেই ছিলেন সুগায়িকা, অনেকেই নামাজ পড়ার এমাম, ও অনেকেই ব্যবসা বাণিজ্য চালাবার উপযুক্ত ছিলেন। অন্তঃপুরচারিকাদের শিক্ষা দেবার জন্যই এই স্কুল শিক্ষয়িত্রীগণ নিযুক্ত ছিলেন বলে মনে করা হয়। সম্রাট আকবরের হারেমে থাকা নারীদের রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ফতেপুর সিক্রিতে তাঁর প্রাসাদেই তিনি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্মিথ তাঁর ফতেপুর সিকরীতে এবং হ্যাভেল তাঁর 'Hand Book of Agra Taj' গ্রন্থে সম্রাট আকবরের বালিকা বিদ্যালয়ের ছক এঁকেছেন।

জাফর শরীফ তাঁর 'কানুন-ই-ইসলাম' গ্রন্থে মুসলিম ভারতে স্ত্রীশিক্ষার নানা নিয়ম কানুনের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সে যুগে বালিকা বিদ্যালয় তো ছিলই, এমন কী মেয়েদের বিদ্যালয়ের যাবার বয়স হলে ঘটা করে উৎসব করা হত। তিনি আরও বলেছেন, "জারফেশানি নামক একপ্রকার রঙিন কাগজে হাতেখড়ি উৎসব উপলক্ষে কবিতা লেখা হত। আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতিতে ওস্তাদজী মেয়ের পিতা-মাতার সামনে মেয়ের দ্বারা লিখিত কবিতা আওড়ে নিতেন। যখন কোনো মেয়ে নতুন বইয়ের নতুন পড়া ধরতো, মেয়ের পিতামাতা তার শিক্ষককে আনন্দভোজেই শুধু আপ্যায়িত করতেন না, তাঁকে যথাযোগ্য পুরস্কারও দিতেন। কোরান পাঠ সেকালের মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার অবশ্য পাঠ তালিকাভুক্ত ছিল। কোনো মেয়ের কোরান পাঠ খতম হলে ঘটা করে উৎসব করা হত। ওস্তাদকে এনাম খেলাত দেওয়া হত এবং এতদুপলক্ষে সমস্ত মক্তবেরই অর্ধেক দিনের দুটি মঞ্জুর হত।"[২]

এই সব বিধিব্যবস্থা শুধু এই দিল্লির সুলতান বা মোগল রাজদরবারেই প্রচলিত ছিল না, প্রাদেশিক রাজ্যগুলিতেও চল ছিল। বিধবা মুসলিম মালিকদের অনেকে মেয়েদের ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা এবং কোরান শিক্ষা দেওয়া জীবনের ব্রত বলে মনে করতেন আর সে মনে

১. তদেব পৃ: ৫২৫
২. মুসলিম ... পৃ: ৫২৬

নিজেদের বাড়িতেই তারা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যযুগের মুসলিম ভারতের এ প্রথা নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে এখনও প্রচলিত রয়েছে।

সকলের পক্ষে হয়তো উচ্চশিক্ষা বা শিল্পকলায় পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু অধিকাংশই যাতে প্রাথমিক শিক্ষা পেতে পারে সে দিকে শিক্ষাব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকদের লক্ষ ছিল। মধ্যযুগে ছিল ধর্মশিক্ষা ও ভক্তিশাসিত। তাই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ধর্মবোধ বুদ্ধি যেন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সেজন্য শিক্ষা তালিকায় মনোযোগ দেওয়া হত। মুসলিম ভারতে বহু মহিলা ও বাদশাজাদি শিক্ষা-দীক্ষার ও শিল্প-সাধনায় উন্নত ও মার্জিত রুচির পরিচয় দিয়ে গেছেন। আলাউদ্দিন জাহনি সোজের দৌহিত্রী মাহমালিক বা জানাসুদ্দুনিয়ার নামই শিক্ষিত বাদশাহজাদিদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যেতে পারে। সুলতান নাসিরুদ্দিনের রাজত্ব কালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই সিরাজ সাহ্‌মালিকের পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর হাতের লেখা ছিল মুক্তার মতো পরিষ্কার ও ঝক্‌ঝকে।

দাক্ষিণাত্যের প্রধানা নায়িকা চাঁদ সুলতানা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রমণী ছিলেন। তিনি শুধু যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন না, সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁর অগাধ পারঙ্গমতা ছিল। আরবি, পারসি, তুর্কি, কানাড়ী, মারাঠি ভাষা তিনি এমনভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে, ঐ সব ভাষাতে তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন। চিত্রবিদ্যাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। মধ্যযুগের একজন মহিলার পক্ষে যুদ্ধবিদ্যা ও শিল্পকলায় এতটা সিদ্ধিলাভ সত্যই বিস্ময়কর।

মোগলযুগে কয়েকজন বিদুষী রমণী ঃ

মোগলযুগে কয়েকজন সংস্কৃতি সম্পন্না মহিলা ছিলেন ও সাহিত্যসংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ দান রেখে গেছেন। এঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

সম্রাট বাবরের কন্যা **গুলবদন বানু** বেগমের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মহামতি আকবরের অনুরোধে তিনি **'হুমায়ুন নামা'** রচনা করেছেন। হুমায়ুনের জীবনী ও রাজত্বের তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ এটি। এছাড়া তিনি মূল্যবান কবিতাও রচনা করেছেন। তাঁর একমাত্র কন্যা রাবেয়ার সঙ্গে আকবরের বিয়ে হয় ও প্রায় ৮০ বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিতা হন। সম্রাট হুমায়ুনের ভ্রাতুষ্পুত্রী **সলিমা সুলতানাও** সুশিক্ষিতা ছিলেন। ফারসি সাহিত্যে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত ও 'মাখফী' এই ছদ্মনামে তিনি প্রচুর ফরাসি কবিতা লিখেছেন।

সম্রাট আকবরের দুধমা **মাহাম্ আনকাহ** সুশিক্ষিতা ছিলেন। লেখাপড়া শুধু যে নিজেই ভালোবাসতেন তা নয়, বিদ্যার উৎসাহ দাত্রীও কম ছিলেন না। সত্যকারের শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে মানুষের আর সেবা হতে পারে না তাঁর এমন বিশ্বাস ছিল। তিনি তাঁর আয়ের অধিকাংশই শিক্ষার জন্য ব্যয় করতেন ও নিজ ব্যয় ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ব্যয় তিনি নিজেই বহন করতেন।

সম্রাট জাহাঙ্গিরের স্ত্রী **নূরজাহান** শুধু বুদ্ধি ও সৌন্দর্যেই খ্যাতনামা ছিলেন না। অসম্ভব প্রতিভাশালিনী ছিলেন। তাঁর শারীরিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষের একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। তিনি আরবি ও ফারসি সাহিত্যেও বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। কোনো কোনো সময় সাম্রাজ্যের কঠিন ও জটিলতম সমস্যারও সুমীমাংসা করতেন। তাঁর বহুবিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিতে নিয়ে বিশিষ্ট

Scanned with CamScanner

গবেষক, ঐতিহাসিক ড. বেনীপ্রসাদ তাঁর ''History of Jahangir'' গ্রন্থে বলেছেন, "Nature has endowed with a quick understanding, a piercing intellect, a versatile temper, with a sound common sense, ... she was versed in persian Literature and Composed verses, limpid and flowing which assisted her in capturing the heart of her husband.'' শের আফগানের মৃত্যুর চার বছর পর চৌত্রিশ বছর বয়সে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নূরজাহানের (জগতের আলো) বিবাহ হয়। এখন তিনি তাঁর প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পেলেন। দান-খয়রাত ছাড়া, নানা প্রকার খাদ্যরন্ধনের কৌশল প্রদর্শন করা, অলঙ্কার এবং পোশাকাদি বিষয় নতুন নতুন ডিজাইন আবিষ্কার করা, অশ্বারোহণ ও অস্ত্রচালনায় দক্ষতা প্রদর্শন করা প্রভৃতি। এগারো বছর তিনি সে সময়কার বিরাট এক সাম্রাজ্য পরিচালনা করে গেছেন। জাহাঙ্গীর তাঁর ওপর রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে ও আরামে দিন কাটাতে পেরেছিলেন। তাঁর স্বাক্ষরেই ফরমান বের হত। মুদ্রার একপিঠে তাঁর নাম ও মুদ্রিত হত। তিনি দীর্ঘ বাহাত্তর বছর বেঁচেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর উনিশ বছর পর ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এখন তাঁর সমাধির উপরে আছে একটি অতি সাধারণ গম্বুজ, বিষাদ, অবহেলা আর উপেক্ষা ঘিরে রয়েছে তাঁর মরদেহকে। তাঁর স্মৃতিফলকে লেখা আছে এই করুণ লিপিটি— যা বাংলা অনুবাদে দাঁড়ায়—

"(আমাদের) নিঃসঙ্গ সমাধিক্ষেত্রে নাহি ফুটে ফুল,
নাহি কোন গান গায় বিহঙ্গের কুল
প্রিয়জন-হস্ত-দীপে না হরে আঁধার
দেখা নাহি যায় হেথা পতঙ্গের পাখার বাহার।"

(অনুবাদ—সচ্চিদানন্দ ধর)

সম্রাট সাহজাহানের প্রিয়তমা মহিষী **মমতাজ মহল** ছিল আসফ খানের কন্যা। তাঁর সাহিত্যপ্রীতি সুবিদিত। তিনি ফারসি ভাষায় বহু কবিতা রচনা করেছেন।

জাহানারা (১৬১৩-৮৩) ছিলেন সম্রাট শাজাহান ও মমতাজের ভাগ্যবতী কন্যা। তাঁর মধ্যে অসামান্য সৌন্দর্য ও অসাধারণ প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছিল। (rare beauty combined with rich intellectual talents.)। তাঁর প্রজ্ঞা, প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষানুরাগ, বদান্যতা বিদ্যোৎসাহিতা তাঁকে ''first lady of Realm) এ পর্যবসিত করেছিল। সঙ্গীত ও শিল্পসাধনায়, জীবনী ও ইতিহাস রচনায়, ও অন্যান্য নানা গুণে মধ্যযুগে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। রাজদরবারের সামজিক আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবাদির বিধান তিনিই দিতেন ও রাজধানীর মহিলা মহফিলে অনুষ্ঠিত বিবিধ সভায় তিনিই সভাপতিত্ব করতেন। ফারসি সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি ঐ ভাষায় অনুপম কবিতা রচনা করতে পারতেন। এই মহিয়সী মহিলার বিনয় ও সৌজন্যের তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর সমাধি স্তম্ভের ওপরে তাঁর নিজের রচনায় লেখা রয়েছে— যাতে তাঁর জীবনদর্শন স্পন্দিত—

''Let nanght but green grass cover my grave;
For Mortals poor 't' is a grave cover brave!

—"আমার কবরের ওপর কেউ যেন মাটি আর তৃণলতা ছাড়া আর কিছুই না দেয়, কারণ দরিদ্রের কবরে সেগুলোই ভালো শোভা পায়" (Let not any person cover my

tomb with anything other than earth and grass, for they are the best fitted for the graves of the poor).

সম্রাট শাহজাহানের চতুর্থ কন্যা জাবিন্দা বেগমও শিক্ষিতা ছিলেন। তিনিও ফারসিতে কবিতা রচনা করতে পারতেন। তাঁর লেখা বহু মরমি কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। সাতি-উন-নেসা-নামক এক মহিলার নাম পাওয়া যায় যিনি তাঁর বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের জন্য সাহজাহান কন্যা জাহানারার, শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। কোরান, হাদিস, ও ইসলামের শরিয়তে তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ফারসি সাহিত্যেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কন্যারা সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের তাঁর এক অধ্যাপকের কাছ থেকে মনোমত ও যথোপযুক্ত শিক্ষা পাননি বলে সেই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে দীর্ঘ অভিযোগ পত্র দেখা যায়। তিনি নিজে মনে করতেন, উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া কোনো মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সত্যকারের পূর্ণ মানুষ হতে গেলে যে শিক্ষার প্রয়োজন ঔরঙ্গজেব সেই শিক্ষার কথাই বলে গেছেন। তাঁর শিক্ষার আদর্শ তাঁর কন্যা জেব্-উন্-নিসার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছিল বলে মনে করা যায়। তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তার জন্য পিতার খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি আরবি ও পারসি সাহিত্যে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। অসামান্য কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে 'Diwan-i-Makhfi' (দীওয়ান-ই-মাখফি) ও **Zibul Munshaat** (জেবুল মানসাআত) নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ স্মরণীয়। তাঁরই প্রেরণায় মোল্লা সাফিউদ্দিন আরদ্‌বেলি সর্বপ্রথম ফারসিতে পবিত্র কোরানের সুবিস্তৃত জেবুৎতাফ্‌সির রচনা করেন। এই সাধ্বী রমণী সাহিত্য সেবায়, শাস্ত্রাদি চর্চায় ও জ্ঞানের সাধনায় সারা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

এঁরা ছাড়া ধর্মশীলা নারী বিবি ফতিমা সাম, বিবি জলীখা, বীরাঙ্গনা চাঁদ বিবি (১৫৪৭-৯৯), সাহিব জী প্রমুখ আরও অনেকের নাম করা যেতে পারে যাঁরা সত্যই মুসলিম ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে মুসলমানেরা ভারতে শাসনকালে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মোটেই অনুদার ছিলেন না। কিন্তু মুসলমান রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের জাতীয় জীবনে একটা দুর্দিন নেমে এলো। মুহম্মদ হাই মন্তব করেছেন," ইংরাজ সরকারের মুসলমানের প্রতি বিরোধিতা, মুসলমানের অহিতকর আইন প্রণয়ন ও সরকারি চাকরি থেকে তাদের অপসারণ করার জন্য ধীরে ধীরে মুসলমানদের জীবনে আর্থিক দুর্গতি ঘনিয়ে এল। আর্থিক অবনতির সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে বসলো। ১৭৫৭ সাল থেকে মুসলমানদের এ পতনের শুরু এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সে পতনের পূর্ণতালাভ।"[১] এরপর বাঙালি মুসলমান সমাজ উন্নত হয়েছে, তাঁরা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হয়েছে। বাঙালি মুসলিম মেয়েরাও আর পিছিয়ে থাকলেন না। তাদেরও এগিয়ে যাবার পথ চলা শুরু হল।

১. মুসলিম ভারতে স্ত্রীশিক্ষা—মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলি (১ম) পৃ: ৫২৬

Scanned with CamScanner